সংবাদ

তারিখ 10 APR 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক এ অচলাবস্থার শেষ কোথায়

মোস্তফা যুবাইর আলম

যে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে পেছনে রেখে যখন মেধা তালিকায় আসন নিশ্চিত হয়, তখন যে যাই বলুক ওই ভর্তিচ্ছুর আনন্দের আর সীমা থাকে না। আমরাও এক সময় ভর্তিচ্ছু ছিলাম। দেশের অনেকগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলেও কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাড়া কোন গতি করতে পারিনি। যদিও যখন চান্স পেয়েছিলাম তখন অনেক আনন্দ পেয়েছিলাম, অনেক কিছুই মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ যেন সবকিছু ধোঁয়াশার মতো লাগে। বিবেকের দংশনে বার বার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়- এ অচলাবস্থার শেষ কোথায়?

কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ থেকে যথাক্রমে ২৪ ও ২২ কিমি দূরবর্তী এই অজপাড়াগাঁয় কেন যে তৎকালীন শিক্ষাবিদরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আমার বোধগম্য হয় না। হয়তো তাদের স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে এ অজপাড়াগাঁ আর শিক্ষাবঞ্চিত থাকবে না, পৌঁছে যাবে সবার ঘরে শিক্ষার আলো। সবাই সভ্য হয়ে গড়ে উঠবে। স্বপ্নটা দেখা স্বাভাবিক। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্তী জেলাদ্বয়ের দ্বন্দ্বের কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয় দুরবস্থার অতলগহ্বরে নিমজ্জিত হয়।

শান্তিডাঙ্গার দুলালপুরের ১৭৫ একরে প্রতিষ্ঠা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। যার নাম দেওয়া হয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। যে নামের কারণে মনে হয়, এটা যেন সাম্প্রদায়িকতার এক অনন্য মূর্তি। এখন অন্য সম্প্রদায়গুলোও দাবি করবে যে, তাদের সম্প্রদায়ের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় করে দিতে হবে। তা আর হচ্ছে না, কেননা নামে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হলেও কার্যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই এ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে সব সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরাই পড়াশোনা করেন। আর ইসলামী নাম থাকলেও কোন আধুনিক শিক্ষা থেকে পিছিয়ে নেই এ বিশ্ববিদ্যালয়। তাই ভর্তি হয়ে এসব কিছু জানতে পেরে অনেক ভালোই লাগছিল। কিন্তু সেই ভালো লাগা আজ বিষফোঁড়া হয়ে আমার নিজেকেই দংশন করছে। যা আর সহ্য করতে পারছি না। এ কথা শুধু আমার না, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর মনের কথা। যারা সবাই প্রতিনিয়ত ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে অথচ তাদের উদ্ধারের কেউ নেই।

কেন এসব বলছি জানেন? দুঃখে জর্জরিত হয়েই বলছি। আর দুঃখটা হলো যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানের কোন সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ নয়, এটা অদক্ষ জনবল নিয়োগের উর্বর ভূমি। যেখানে বছরের পর বছর অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আর যেখানেও মহাআমলা: নিয়োগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের হাতে সবসময় জিম্মি হয়ে পড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়। অচল হয়ে যায় সব কার্যক্রম। শুধু একটা জিনিসই অচল হয় না, আর তা হলো এখানে চাকরিরত সবার মাসিক বেতন প্রক্রিয়া। তবে যে যাই বলুন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক ইতিহাস হলো এই যে যখন যে সরকারের অধীনে কর্তৃত্ব পেয়েছে সে তখনই বেকারত্ব দূরীকরণে সরকারকেই মারাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছে অদক্ষ-অযোগ্য জনবল নিয়োগ দিয়ে। যা পরবর্তীতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভয়াল ব্যাধি হিসেবে পরিণত হয়েছে। ব্যাধি এমন রূপ ধারণ করেছে যে যতই চাপাচাপি কর না কেন কোন কাজ হবে না? এ ব্যাধি ঘোচাতে হলে বর্তমান সরকারকেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে ইউজিসিকে নিয়োগের ব্যাপারে অতীব তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করতে হবে। সেটা শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয়। কেননা, দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ কালো ব্যাধি বিস্তারের প্রবল চেষ্টা চলমান রয়েছে। সুতরাং এ মুহূর্তে যদি কার্যকরী ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও এ যত্রতত্র অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে চলতে হবে।

যে যাই হোক, বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কার্যক্রমই হলো জনবল নিয়োগ দেয়া। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নির্বাচনেও যে সরকারদলীয়রা হেরে যায়। আবার রাজনৈতিক সিদ্ধি অর্জন, অর্থোপার্জনও এ জনবল নিয়োগের মূল কারণ। অথচ সেই নিয়োগকে কেন্দ্র করে নিয়োগবঞ্চিতদের আন্দোলনে দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ থাকে এ ক্যাম্পাস। যা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাগুলো নিয়ম হয়ে গেছে, আর তা ধারাবাহিকভাবেই চলছে। এ ধারাবাহিক অচলাবস্থা নিরসনে সরকারিভাবে আজও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। অথচ শুধু জনবল নিয়োগেই সীমাবদ্ধ নয়, অদক্ষ-অযোগ্য লোকদের অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়ার এ প্রক্রিয়ায় বাধা দিলে শিক্ষক হন আর যাই হন গণধোলাই খেতে হয়। যা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এ দুরবস্থা থেকে এ ক্যাম্পাস কি উদ্ধার হবে না?

স্থানীয় লোকজনের চারণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত প্রশাসনিক কোন শক্তি নেই বললেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা যেন স্থানীয় লোকজনের হাতের পুতুল। তারা যেভাবে চাইবে সেভাবেই চলতে হবে অন্যথায় ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। শুধু কি তাই, ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ, মারামারি, বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির যাবতীয় সরঞ্জাম ঐ স্থানীয়রা দেয়। এ স্থানীয়রা যে কারা তা সবার কাছে সুস্পষ্ট। আর তারা হলো চাকরিপ্রত্যাশী সাবেক ছাত্রনেতা ও এলাকার প্রভাবশালী নেতৃবর্গ। আর তাদের সবসময় সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনগুলোকে সহায়তা করতে দেখা যায়। অন্যথায় যে চাকরি হবে না। ক্যাম্পাসের সংঘর্ষগুলোতে দেশীয় অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন অস্ত্রের মহড়া দিতে এ স্থানীয়রাই যেন সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনগুলোর শক্তিশালী হাতিয়ার। ফলে স্থানীয়দের কাছে ছাত্র রাজনীতিও জিম্মি হয়ে রয়েছে।

অনেক স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভর্তি হওয়ার পরে আজ যেন মনে হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যেন সবচেয়ে বড় ভুল। কেননা, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হলেও এখানে মূলত তার বিদ্যের অনুপস্থিতি। সহজে বলা যায়, বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৪৭ দিন ক্যালেন্ডারের নির্ধারিত ছুটি। আর ২১৮ দিনের মধ্যে নিয়োগ বাণিজ্যের জের ধরে ১০০ দিনেরও বেশি সময় বন্ধ থাকে এ ক্যাম্পাস। তাহলে বছরে মূলত ১১৮ দিনেরও কমসময় ক্যাম্পাস চলে। অতএব শিক্ষার মান কোথায় গিয়ে উঠছে তা সবার নখদর্পণে। ধারাবাহিক অচলাবস্থা যেন এ ক্যাম্পাসের নিত্যদিনের সঙ্গী। যার মূল কারণই হচ্ছে জনবল নিয়োগ। আর এ জনবল নিয়োগকে কেন্দ্র করে ২০১৩ সালে প্রায় ৩ মাস, ২০১২ সালে ৫ মাস ক্যাম্পাস অচল ছিল। বর্তমানে এ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা চলমান রয়েছে। অথচ এর স্থায়ী কোন সমাধানের চিন্তা কেউ করছে না।

এ ক্যাম্পাসের অচলাবস্থা মূলত ২টি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যার একটি নিয়োগ কেন্দ্রিক আর অন্যটি ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ কেন্দ্রিক। দ্বিতীয়টির তেমন প্রভাব না থাকলেও ১মটির প্রভাবে অতিষ্ঠ ইবি ক্যাম্পাস। আর নিয়োগ কেন্দ্রিক আন্দোলন হয় ২ ভাবে। এক নিয়োগপ্রত্যাশীদের আন্দোলন অন্যটি নিয়োগ বাণিজ্যের প্রতিবাদে প্রশাসনবিরোধী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। আর এই দুই পদ্ধতির আন্দোলনে প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যায়। তবে আন্দোলন কিভাবে শুরু হয় সে বিষয়টিও বলে রাখা দরকার। প্রথমে চাকরিপ্রত্যাশী সরকারদলীয় সাবেক নেতাকর্মীরা ও স্থানীয় প্রভাবশালী নেতারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বিভিন্নভাবে চাপ দিতে থাকে যে, দ্রুত নিয়োগ দিতে হবে অন্যথায় ক্যাম্পাস অচল করে দেয়া হবে। এতে প্রশাসন রাজি না হলে শুরু হয় অচলাবস্থা। অবশেষে প্রশাসন নিয়োগের ব্যবস্থা করলে তারা আন্দোলন উঠিয়ে নেয়। তারপর নিয়োগ পরবর্তী সময়ে নিয়োগবঞ্চিতদের আন্দোলন শুরু হয় এভাবে যে নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকাল ক্যাম্পাস অচল করে দেয়া হবে। এ সময় তারা মহাসড়ক অবরোধ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের কুশপুত্তলিকা দাহ করে, পরিবহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। এরপর শুরু প্রশাসনবিরোধী শিক্ষকদের আন্দোলন। তাদের আন্দোলনের স্লোগান এরকম যে নিয়োগ বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতদের অপসারণ না করা পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এভাবে নিয়োগকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম হয়। যার ফলে ক্যাম্পাসে প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট বৃহত্তর থেকে বৃহত্তম আকার ধারণ করে। শিক্ষার্থীদের ৪ বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে ৬-৭ এমনকি ৮-৯ বছর লেগে যাচ্ছে। তাও আবার মানসম্মত শিক্ষা ছাড়াই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় এ ক্যাম্পাসের যাতাকলে পিষ্ট হয়। অথচ যে বিদ্যাপীঠ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দানের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেখানে বিদ্যাদান বন্ধ রেখে চলছে অবাধে নিয়োগবাণিজ্য। নিয়োগের পর নিয়োগই যেন এ ক্যাম্পাসের প্রধান কাজ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। আর সেই নিয়োগকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ধারাবাহিকভাবে অচলাবস্থা চলমান রয়েছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে তথাপি বর্তমান সরকার বল আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বল, কারো কোন মাথাব্যথা নেই, কোন চিন্তা নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় এরকম বিশ্ববিদ্যালয় থাকার চেয়ে না থাকায় ভালো। আর যদি থাকে তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক অচলাবস্থার শেষ কোথায়?

[লেখক : শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

zubaeria19@gmail.com